স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

দেশী মুরগি ও হাঁস উৎপাদন বৃদ্ধির সহজ পদ্ধতি

ফেব্রুয়ারী - ২০২০

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

সহযোগিতায়ঃ এসএসডব্লিউআরডিপি-২ (জাইকা)
এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সূচিপত্র

দেশী মুরগি ও হাঁস উৎপাদন বৃদ্ধির সহজ পদ্ধতি

অধিবেশন-১ঃ	পোলট্রি খামার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াবলী (ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা এবং মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা)	৪
অধিবেশন-২ঃ	ডিম পাড়া মুরগি পালন (উমে বসা ব্যবস্থাপনা সহ) ডিম বাছাই ও বাচ্চার যত্ন.	১১
অধিবেশন-৩ঃ	স্থানীয়ভাবে আমিষ ও খনিজ জাতীয় খাদ্য কি কি এবং এর উপকারীতা	১৭
অধিবেশন-৪ঃ	মুরগির রোগ বালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা, ভেষজ পদ্ধতিতে মুরগির রোগ প্রতিরোধ	২১
অধিবেশন ৫ঃ	৪ টি মুরগি পালনের ১ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব	২৮
অধিবেশন-৬ঃ	পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে হাঁস মুরগি পালনের গুরুত্ব	৩০
অধিবেশন-৭ঃ	হাঁসের জাত পরিচিতি, হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	৩১
অধিবেশন-৮ঃ	খাদ্য খাদ্যের উপাদানসমুহ ও এর কাজ	৩৫
অধিবেশন-৯ঃ	হাঁসের রোগ বালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	৩৮
অধিবেশন-১০ঃ	টিকা কি ও কেন? টিকা দেওয়ার নিয়মাবলী	৪১
অধিবেশন-১১ঃ	হাঁসের টিকা প্রদান তালিকা	৪২
অধিবেশন-১২ঃ	পারিবারিক পর্যায়ে ২০ টি হাঁস পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৪৩

অধিবেশন-১ ঃ পোলট্রি খামার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াবলী (ব্রুডিং ব্যাবস্থাপনা এবং মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা)

পোলট্রি শিল্প বাংলাদেশে একটি অন্যতম বৃহৎ ও অর্থকরী শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আমিষের চাহিদা বৃদ্ধির বিপরীতে উৎস ও যোগান হ্রাস, বেকারত্ব ঘোচানোর উপায় ইত্যাদি কারণে পোলট্রি শিল্প বর্তমানে একটি দ্রুত বিকাশমান খাত। সফলভাবে পোলট্রি খামার করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, খামার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ ও তার প্রয়োগ, রোগ নিয়ন্ত্রণ অথবা চিকিৎসা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন আশু প্রয়োজন।

ঘরের আলো ও আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

বাচ্চার ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাচ্চা খাবার ও পানির পাত্র দেখতে পারে। দিনের বেলা আলো থাকলে আলাদাভাবে আলো প্রদানের প্রয়োজন নেই। তবে রাতে বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালিয়ে কৃত্রিম আলো প্রদান করতে হবে। ব্রুডারে বাচ্চা তোলার ৩ দিন পর হতে রাতে ১-২ ঘন্টা অন্ধকার রাখতে হবে, যাতে বাচ্চাগুলি অন্ধকারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বিদ্যুৎ না থাকলে অন্ধকারে ভয় না পায়।

মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং (Brooding) ঃ

জার্মান শব্দ ব্রুড থেকে ব্রুডিং শব্দটি এসেছে। ব্রুডিং শব্দটির অর্থ তাপ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ব্রুডিং কথাটির অর্থ হলো ১ দিন বয়স থেকে ৬-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত (লেয়ার জাতের ক্ষেত্রে এবং ব্রয়লার জাতের ক্ষেত্রে ১ দিন বয়স থেকে ১৪ দিন বয়স পর্যন্ত) মুরগির বাচ্চাকে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা যেমন ঃ- প্রতিকূল আবহাওয়া, বন্যপ্রাণী এবং অন্যান্য সমস্যা থেকে রক্ষা করাকে বুঝায়। যেমন ঃ-একদিন বয়সের মুরগির বাচ্চার শরীরের তপমাত্রা থাকে ১০৩° ফাঃ আর বয়স্ক মুরগির শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১০৬° ফাঃ। বাচ্চা অবস্থায় মুরগির বাচ্চা তার শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ এই সময় তাদের তাপ নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গগুলির বিকাশ ঘটে না। তাই ঠান্ডা, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টি বা অতিরিক্ত গরম ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না। যার জন্য মুরগির বাচ্চাকে এমন একটি কৃত্রিম অবস্থায় রাখতে হয় যাতে মুরগি আরামদায়ক ও নিরাপদ থাকে এবং তাপ নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গগুলির বিকাশ ঘটে। ৪ সপ্তাহ বয়সের পর মুরগির তাপ নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং এ সময়ের পর মুরগি তাপ নিয়ন্ত্রণে স্বকীয়তা অর্জন করে।

মুরগির বাচ্চার প্রথম খাদ্য ঃ

ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার উদর গহ্বরে কুসুমটির কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য বা পানি গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চাগুলি বেঁচে থাকতে পারে। তবে বাচ্চাকে খামারে আনার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি প্রদান করলে দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায় ও বাচ্চা মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে। সেজন্য ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চা পরিবহন করে খামারে আনতে হবে এবং বাচ্চাগুলিকে প্রথমে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে। পানি প্রদানের কমপক্ষে ৩ ঘন্টা পর বাচ্চাগুলিকে খাবার দিতে হবে।

প্রাথমিকভাবে বাচ্চাকে প্রদত্ত পানিতে নিম্ন লিখিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যোগ করতে হবে।

গ্লুকোজ	ঃ	২৫ গ্রাম/লিটার
ভিটামিন সি	ঃ	১ গ্রাম/৪ লিটার
যে কোন একটি মাল্টি ভিটামিন (ডব্লিউ এস)	ঃ	১ গ্রাম/৫লিটার

যদি পানি প্রদানের পূর্বে খাদ্য প্রদান করা হয় তাহলে বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি এবং খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা কমে যায় এবং মৃত্যুর হার অধিক হয়। তাই খাদ্য প্রদানের পূর্বে অবশ্যই বাচ্চাগুলিকে পর্যাপ্ত পানি পান করার সুযোগ দিতে হবে। যদি বাচ্চাগুলিকে অনেক দূর থেকে আনার কারণে ডিম থেকে ফোটার অনেক সময় পরে খাদ্য দিতে হয় সেক্ষেত্রে প্রথম ২-৩ দিন খাদ্যের পাশাপাশি গ্লুকোজ এবং ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স মিশ্রিত পানি প্রদান করা উচিত। যা বাচ্চাগুলিকে পানি শুন্যতা প্রতিরোধে, ভ্রমণজনিত ধকল কাটিয়ে উঠতে এবং সর্বোপরি তাদের খাদ্য পরিপাক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ব্রুডিং এর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঃ

০১। ব্রুডার ঘর ঃ

ব্রুডিং এর জন্য আলাদা ঘর থাকলে ভালো হয়। ব্রুডিং সাধারণত ঃ বড় মোরগ-মুরগির ঘর থেকে কমপক্ষে ১০০ ফুট দূরে পৃথক স্থানে আলাদাভাবে করাই উত্তম। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে বাইরের মুক্ত বাতাস ব্রুডার ঘরে ঢুকতে পারে এবং ভেতরের বিষাক্ত গ্যাস সহজে বাইরে যেতে পারে। লেয়ার বা ব্রয়লার মুরগি পালনের ঘরও ব্রুডার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে প্রথমে নিম্নের কাজগুলো করতে হবে।

বাচ্চা তোলার কমপক্ষে ১ সপ্তাহ আগে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে জীবাণু নাশক দ্বারা ভালোভাবে ধুয়ে শুকাতে হবে। সম্ভব হলে সম্পূর্ণ ঘর চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ফিউমিগেশন করতে হবে। পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ও ফরমালিন দ্বারা ফরমালডিহাইড গ্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে ফিউমিগেশন করা যায়। প্রতি ১০০ ঘনফুট জায়গার জন্য ১২০ সি.সি. ফরমালিন + ৬০ গ্রাম পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা হয়।

সতর্কতা ঃ কখনও ফরমালিনের মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ঢালা উচিত নয়। বরং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মধ্যে ফরমালিন ঢালতে হবে এবং কাঁচের বা মাটির পাত্রে ঢেলে ব্যবহার করতে হবে।

০২। হোভার ঃ

তাপ যাতে উপরের দিকে উঠে না যায় সেজন্য হোভার প্রয়োজন। হোভার টিন, কাঠ বা বাঁকা বাঁশ দ্বারা তৈরী করা যায়। হোভারকে সাধারণতঃ ঝুলিয়ে রাখা হয়। তবে নীচে পায়া লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। ৫ ফুট ব্যাসের হোভারের নীচে ৫০০টি বাচ্চা রাখা যায়।

০৩। ব্রুডার ঃ

মুরগির বাচ্চার ঘরে তাপের উৎসকে ব্রুডার বলে। ব্রুডার হিসাবে বৈদ্যুতিক হিটার, বাল্ব, কেরোসিন বাতি, হ্যাজাক ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে তাপ দেয়া যায়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১০০ ওয়াটের ২টি ও ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব আর শীতকালে ২০০ ওয়াটের ২টি ও ১০০ ওয়াটের ১টি বাল্ব প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য ব্রুডারে ব্যবহার করা যথেষ্ট। বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার ১০-১২ ঘন্টা পূর্ব থেকে ব্রুডার চালু করে প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করতে হবে।

০৪। চিক গার্ড ঃ

ব্রুডার থেকে ২.৫-৩ ফুট দূরত্বে ১.৫ ফুট উঁচু চাটাই বা হার্ডবোর্ডের বা তারের জালের বেষ্টনি তৈরী করা হয়। ফলে বাচ্চা ব্রুডার থেকে দূরে যেতে পারে না। প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য চিক গার্ডের ব্যাস হবে ১২ ফুট। (ব্যাসার্ধ ৬ ফুট। ক্ষেত্রফল = ৩.১৪×৩৬ = ১১৩.০৪ বর্গফুট) প্রতিটি বাচ্চার জন্য জায়গা হবে ১১৩.০৪÷৫০০ = ০.২১৮ বর্গফুট। চিক গার্ডের উচ্চতা গরমের সময় ১-৬´´ ও শীতের সময় ২-৬´´ হবে। বাচ্চা বড় হবার সাথে সাথে চিক গার্ডের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

খাবার পাত্র ও খাবার ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রথম ১-২ দিন ঘন ঘন কাগজ পাল্টিয়ে তার উপর এবং পরবর্তী ১-২ সপ্তাহ ফ্লাট ট্রে ব্যবহার করা যায়। অতঃপর ৩য় সপ্তাহ থেকে হপার বা টিউব ফিডারে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। প্রথম ২ সপ্তাহ ২ ঘন্টা অন্তর অন্তর খাদ্য সরবরাহ করা ভাল। খাবার পাত্রের দৈর্ঘ্য =২´, প্রস্থ = ১-৩´ এবং কিনারা = ১.৫´´ (দেড় ইঞ্চি) হওয়া উচিত। প্রথম ৩ ঘন্টা গ্লুকোজের পানি বা যে কোন ইলেক্ট্রোলাইট পানি দেয়ার পর খাদ্য দিতে হবে। প্রথমে ভুট্টা ভাঙ্গা বা সাগু খাবারের পাত্রে দিলে ভাল হয়। কারণ বাচ্চা প্রথমে ছোট দানা জাতীয় খাবার গ্রহণ করে থাকে এবং এইগুলি সহজে হজমও হয়ে থাকে। খাবার কখনই ব্রুডারের নীচে ছিটানো উচিত নয়। কেন না এতে বাচ্চা ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয় ও রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কিছু অতিরিক্ত খাবার পাত্র (১০%) ব্যবহার করলে ভাল হয়। এতে সকল বাচ্চা বিনা প্রতিযোগিতায় খাবার গ্রহণ করতে পারে। বাচ্চার ওজন ও আকারে সমতা আনার জন্য খাবার শেষ হওয়ার আগে খাবার দেয়া উচিত। ৪ (চার) সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দৈনিক ৩-৪ বার খাবার দিলেই চলবে। এরপর দৈনিক ২ বার খাবার দিলেই চলবে। চিক গার্ডের জায়গা বাড়ার সাথে সাথে ফিডারের পরিমানও বাড়িয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে খাবার বস্তাসহ ফিউমিগেশন করে নেয়া ভাল।

পানির পাত্র ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

বাচ্চার জন্য ছোট প্লাষ্টিকের পানির পাত্র পাওয়া যায়। ছোট টিনের কৌটার নীচে থালা বসিয়েও পানির পাত্র বানানো যায়। পানির পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে প্রতিদিন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। নলকূপের পানি সরবরাহ করা অনেক নিরাপদ। সুষ্ঠু ও স্বাষ্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য নীচের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

২ ঘন্টা গ্লুকোজ বা ইলেক্ট্রোলাইট মিশ্রিত পানি খাওয়ানোর পর যদি প্রয়োজন হয় তবে এন্টিবায়োটিক বা অন্যান্য ঔষধ পানির সাথে মেশানো যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় পানিতে কখনও কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে পানি তিতা হয় অর্থাৎ পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বাচ্চা পানি গ্রহণ করতে চায় না।

প্রথম অবস্থায় প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য ১ লিটার সাইজের ৬-৮টি ড্রিংকার দিতে হবে। এতে করে সকল বাচ্চা একসঙ্গে পানি খেতে পারে।

প্রতি ড্রিংকারে পানি ১/২ লিটার করে দিতে হবে এবং প্রতিবারেই পানি দেওয়ার পূর্বে ড্রিংকার ভালোভাবে ধৌত করার পর জীবাণুমুক্ত করে দিতে হবে।

সরবরাহকৃত খাবার পানিতে ক্লোরিন ৩ পিপিএম মাত্রায় ব্যবহার করা ভালো। অর্থাৎ ১০০ লিটার পানিতে ৩০০ মি.গ্রা. ক্লোরিন মিশানো যেতে পারে। অবশ্য ভ্যাকসিন বা ঔষধ পানিতে খাওয়ানোর সময় ক্লোরিন ব্যবহার করা উচিত নয়। পানির তাপমাত্রা প্রথম অবস্থায় ২৫°-৩০° সেঃ তপমাত্রায় রাখা ভালো।

বাংলাদেশের অধিকাংশ বাড়িতে একাধিক হাঁস- মুরগি পালন করে থাকে। সুতরাং দেখা যায় দেশি হাঁস ও মুরগি তাদের পুষ্টি ও আয়ের একটি অন্যতম উৎস। কিন্তু হাঁস ও মুরগি থাকার কোন ভাল ব্যবস্থাপনা না থাকায় তারা যথাযথ আয় থেকে বঞ্চিত হয়। বাসস্থানের কারনে হাঁস ও মুরগি রোগাক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। এমনকি হাঁস ও মুরগির বৃদ্ধি কম হয় ফলে উৎপাদনও কমে যায়। তাই হাঁস ও মুরগির বাসস্থানের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

বাসস্থানঃ

বাসস্থান হল এমন একটি থাকার জায়গা যেখানে মুরগি নিরাপদে আরামে এবং সুষ্থ পরিবেশে বসবাস করতে পারে। মুরগি একটি উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। তারা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু চরম আবহাওয়ায় তারা পরিবেশের সাথে টিকতে পারে না। তাই তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন।

কেন বাসস্থানের প্রয়োজন ঃ

- বিশ্রাম ও নিরাপদে থাকার জন্য।
- রৌদ্র, ঝড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য।
- বন্য প্রানীর আক্রমন বা চোরের হাত হতে রক্ষার জন্য।
- ডিম পাড়ার জন্য।

- মুরগিকে সঠিক ভাবে খাদ্য ও পনি খাওয়ানোর জন্য।
- দৈহিক বা ওজন বৃদ্ধির জন্য।
- রোগমুক্ত থাকার জন্য বা পীড়ন থেকে রক্ষার জন্য।

হাঁস ও মুরগির কেন আলাদা হওয়া দরকার ঃ

আমাদের দেশে সাধারণত হাঁস-মুরগি এক সাথে রাখা হয়। কিন্তু এক সাথে হাঁস-মুরগি রাখলে রোগের ঝুঁকি বাড়ে এবং স্বাস্থ্য সম্মত হয় না। হাঁসের মলে জলীয় অংশ বেশি হওয়াতে হাঁসের ঘর স্যাত স্যাতে হয়। এ জন্য হাঁস-মুরগির ঘর আলাদা হওয়া উচিত।

তাছাড়া, গ্রামীণ পর্যায়ে যে সব মুরগির ঘর/খোয়াড় থাকে তাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকার ব্যবস্থা থাকে না। নিয়মিত মুরগির বিষ্ঠা পরিস্কার করা হয় না। ফলে ঘরে দুর্গন্ধ হয়, ঠাসাঠাসি করে অতিরিক্ত মুরগি এক সাথে থাকায় রোগাক্রান্ত হয়। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ করে মুরগি মারা যায়।

অতএব মুরগির ঘরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

- পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- অতিরিক্ত মুরগি বা হাঁস-মুরগি এক সাথে রাখা যাবে না।
- খাদ্য ও পানির পাত্র রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রতিদিন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

মুরগির ঘর তৈরীর উপকরণ সমুহঃ

সুতার জাল, বাঁশ, সুপারি গাছ, গাছের ডাল, শুকনো খড়, নেট, ছন, পলিথিন ইত্যাদি।

মুরগিকে সাধারানতঃ দুই ধরনের ঘরে পালন করা হয়।

ক) দিনে থাকার ঘর।

খ) রাতে থাকার ঘর।

দিনে থাকার ঘর ঃ

দিনে মুরগিকে আধা ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, মুরগিকে সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায় পালন করে। এতে মুরগি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সবসময় সংগ্রহ করতে পারে না, মাঝে মধ্যে বন্য প্রাণী যেমন- চিল, শেয়াল, বনবিড়াল দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে কৃষক মুরগি থেকে কাঙ্খিত আয় পেতে ব্যর্থ হয়। তাই মুরগিকে আধা ছাড়া অবস্থায় অর্থাৎ দিনে কিছু সময়ের জন্য মুরগিকে আবদ্ধ রেখে পালন করলে তাদেরকে সঠিক ভাবে খাদ্য ও পানি দেওয়া যায়। পাশাপাশি পরিবেশ থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৫ টি মুরগির জন্য দিনে থাকার ঘর-
৫ হাত দৈর্ঘ্য, ১.৫ হাত প্রস্থ, এবং ২ হাত উঁচু করে ঘর তৈরী করতে হবে।

মুরগির বাচ্চার বাসস্থান ঃ

Farmer making a confinement cage

Safe from predators: Mother hen and chicks under the semi-scavenging system

দিনের বেলায় বাচ্চাকে ঝাপিনের নিচে প্রথমে খড় তারপর চট বা বস্তা তার উপর খাদ্য, পানির পাত্র দিয়ে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে হবে। এতে বাচ্চা ঠিক মত খাদ্য ও পানি পাবে এবং ঠান্ডা ও বন্য প্রাণীর আক্রমন হতে রক্ষা পাবে। ১ মাস পর বাচ্চাগুলোকে একটা নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে ঘর তৈরী করে রাখতে হবে। প্রতি ২০ টি মুরগির বাচ্চার জন্য ২.৫ হাত দৈর্ঘ্য, ১.৫ হাত প্রস্থ, এবং ১.৫ হাত উঁচু করে ঘর তৈরী করতে হবে। ঘরের উপরে শুকনো খড় বা ছন দিয়ে ছানি দিতে হবে। ঘরের পাটাতন সুপারি গাছ বা বাঁশ দিয়ে তৈরী করা যায়। পাটাতনের উপর চটের বস্তা বিছিয়ে পুরো পাটাতন ঢেকে দিতে হবে। বাচ্চা যদি মাটিতে রাখা হয় সেক্ষেত্রে বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। বিছানা হিসাবে শুকনো ধানের তুষ ব্যবহার করা যায়। বিছানা ব্যবহারের ফলে বাচ্চার পায়খানা বিছানার সাথে মিশে যায় ফলে, মেঝে ভিজা থাকে না, বাচ্চার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বিষ্ঠা জৈব সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা যায়।

রাতে বাচ্চার/মা মুরগি থাকার ব্যবস্থা ঃ

রাতে বাচ্চা/মা মুরগি গুলোকে তলা যুক্ত বাঁশের খাঁচায় রাখা যায়। খাঁচার মধ্যে বিছানা হিসাবে খড় কুটা ব্যবহার করা উচিত। এতে করে মুরগির বাচ্চারা আরামদায়ক পরিবেশ পায়। অবশ্যই ব্যবহৃত খড় কুটা প্রতিদিন রোদে শুকাতে হবে।

রাতে থাকার তলাযুক্ত বাঁশের খাঁচা ৫ টি ডিম পাড়া মুরগির জন্যঃ

খাঁচার তলা	-	১.৫ হাত
উচ্চতা	-	১ হাত
মুখ	-	১/২ হাত

অধিবেশন-২ ঃ ডিম পাড়া মুরগি পালন (উমে বসা ব্যবস্থাপনা সহ) ডিম বাছাই ও বাচ্চার যত্ন

ভুমিকাঃ

গ্রামাঞ্চলের কৃষক সাধারনত দেশী মুরগি প্রতিপালন করে থাকে। তবে মাঝে মাঝে উন্নত জাতের ফাওমি ও সোনালী মুরগি প্রতিপালন করতে দেখা যায়। ফাওমি ও সোনালী মুরগি শুধু ডিম পাড়ে কিন্তু কখনও উমে বসে না। তাই কৃষক পর্যায়ে ডিম ফুটানোর জন্য দেশী মুরগির বিকল্প নাই। এই ক্ষেত্রে অধিক ডিম ফোটানোর জন্য ডিম ফুটানো মুরগি নির্বাচন খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

ডিম ফুটানো মুরগির বৈশিষ্ট্য ঃ

মুরগির আকার বড়, রং উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যবান হতে হবে। কারণ মুরগির আকার যত বড় হবে তত বেশী ডিমে তা দিতে পারবে। একটি ডিম পাড়া মুরগি তার ওজনের অর্ধেক ডিমে তা বা উম দিতে পারে। ১ টি দেশী মুরগির ওজন যদি ১.৫ কেজি হয় তাহলে ১৫-২০ টি ডিমে উম দিতে পারবে। সুতরাং ডিম ফুটানের ক্ষেএে দেশী বড় মুরগি বাছাই করা সুবিধাজনক।

বর্তমানে গ্রামঞ্চলে ডিম পাড়া মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা ঃ

আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে সনাতন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করে আসছে। পরিবারের মহিলারাই প্রধানত এই হাঁস-মুরগি পালন করে থাকেন। সনাতন পদ্ধতিতে পালন করতে গিয়ে যে কাজগুলো করে থাকে তা হলোঃ

- মুরগিকে নিয়মিত খাদ্য ও পানি দেয়া হয় না।
- কোন প্রকার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হয় না, নিলেও তা পর্যাপ্ত নয়।
- রোগব্যাধি হলে সঠিক চিকিৎসা করানো হয় না।
- নিয়মিত ঘর, খাঁচা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না।
- বাচ্চা ফুটার পর বাচ্চাকে মায়ের সাথে ৩-৪ মাস ধরে চরতে দেয়া হয়।

বর্তমান ব্যবস্থাপনার ফল ঃ

ওজন কমে যায় এবং মুরগি সময়মত ডিম দেয় না। দিলেও কম ডিম দেয়।

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

যে পরিমানে আয় আসার কথা সেই পরিমান আয় আসে না। ফলে কৃষক আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডিম ফুটানো মুরগিকে সুস্থ রাখার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খুবই গুরত্বপূর্ণ ঃ

- নিয়মিত টিকা দেওয়া ও কৃমির ঔষধ খাওয়ানো।
- ঘর বা খাঁচা এবং ঘরের আসে পাশে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- মুরগিকে নিয়মিত গোসল করানো জন্য একটি গর্ত করে কিছু পরিমান বালি ঘরের পাশে গর্তে রেখে দিলে মুরগি সেখানে গোসল করতে পারবে। গোসলের ফলে মুরগির গায়ের পোকা দুর হয়।

ডিম পাড়া মুরগির খাদ্য ব্যবস্থা ঃ

যেহেতু মুরগি ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয় তাই দৈনিক ১ টি মুরগিকে ৫০-৬০ গ্রাম সুষম খাদ্য সরবরাহ করলে ডিম উৎপাদনের হার বেড়ে যায়। যদি সুষম খাদ্য না খাওয়ানো হয় তাহলে ধান, ভুষি, খৈল, কুড়া ও ১ চিমটি লবন একসাথে মিশ্রিত করে ১ টি মুরগিকে (২ মুষ্টি) দিনে দুই ভাগে ভাগ করে খাওয়ানো যেতে পারে। খাদ্য অবশ্যই খাদ্য পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। পানির পাত্রে পরিমান মত টিউবওয়েলের পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন খাদ্য এবং পানি খাওয়ানোর পর খাদ্যপাত্র এবং পানির পাত্র পরিস্কার করে রাখতে হবে।

ডিম সংরক্ষণ ঃ

ডিম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

- এক সাথে যাতে সবগুলো ডিম ফুটে
- ডিম ফুটানোর হার বাড়ানোর জন্য

মুরগি সাধারনতঃ যে পাত্রে ডিম পাড়ে এই রকম আরেকটি পাত্রে ডিম সংরক্ষণ করা যেতে পারে। পাত্রটি ঘরের নিরাপদ স্থানে ঠান্ডা জায়গায় রেখে মুরগির পাড়া (প্রথম ৫-৬ টি ডিম বাদ দিয়ে) ডিমগুলো এক এক করে সংরক্ষণ করতে হবে। ডিম পাড়া শেষ হওয়ার পর মাটির পাত্রে সংরক্ষিত ডিমগুলো নিয়ে এসে উমে বসিয়ে দিতে হবে। গরম কালে ১০-১২ টি ডিম এবং শীত কালে ১৫-১৬ টি ডিম এক সাথে বসালে ডিম গুলো ভাল ভাবে ফুটবে।

ডিম বাছাই ঃ

ডিম ফুটানোর জন্য মাঝারি আকারের ডিম বাছাই করতে হবে। খুব বড় খুব ছোট, লম্বা অথবা ময়লা যুক্ত ডিম উমে বসানো যাবে না। এই ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ ময়লাযুক্ত ডিম একটি ভিজা নেকড়া দিয়ে মুছে ফেলে ওমে বসানো উত্তম।

ডিম পাড়ার টুকরী ঃ

বেশী ডিম এক সাথে তা দেয়ার জন্য যেমন বড় আকারের মুরগির দরকার, তেমনি ডিম বসানোর জন্য ডিমের টুকরীও তুলনামূলক বড় হতে হবে। ডিমের টুকরী বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, বাঁশের ঝুড়ি, কাগজের বাক্স, কাঠের বাক্স, মাটির তৈরী ইত্যাদি। এই টুকরীগুলোর মধ্যে মাটি দিয়ে তৈরী টুকরী সবচাইতে ভাল হয়। মাটি দিয়ে টুকরী তৈরী করা হলে কোন টাকা পয়সা খরচ হয় না। টুকরীর গঠন নিম্নরুপ ঃ-

- টুকরীর তলা ১০ ইঞ্চি অথবা পোনে এক হাত
- উচ্চতা ৭ ইঞ্চি অথবা এক বিঘা
- উপরীভাগ ১৬ ইঞ্চি অথবা প্রায় এক হাত

এই টুকরীর সুবিধা ঃ

- এক সাথে বেশী ডিম সমান্তরালভাবে বসানো যায়
- মুরগি ডিমে সমানভাবে তাপ দিতে পারে
- মুরগি টুকরীতে আসা যাওয়ার সময় টুকরী উল্টে যায় না
- খরচ কম

উমে বসানো ঃ

বাচ্চা ফুটানোর জন্য বাশেঁর তৈরী টুকরি অথবা মাটির টুকরি (পুর্বে উল্লেখিত ডিমের টুকরী) মধ্যে প্রথমে কিছু পরিমান ছাই তারপর কিছু খড় দিয়ে তার উপর ডিম বসিয়ে দিতে হবে। মুরগির গায়ে যাতে গুনগুনি না ধরে তার জন্য একটি কর্পুরের গুড়া (নেপথেলিন) ছাইয়ের সাথে গুড়ি করে মিশিয়ে দিতে হবে। মুরগিকে উমে বসানোর পর খাদ্য ও পানি সরবরাহের জন্য নারিকেলের মালার মধ্যে খাদ্য ও পানি আলাদা আলাদা ভাবে সবসময় মুরগির সামনে রেখে দিতে হবে। উমে বসা অবস্থায় ডিমে তা দেওয়া মুরগিকে দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য অথবা দুই মুষ্টি ধান, ভুষি, কুঁড়া, চাউল ও এক চিমটি লবন দিতে হবে। সেই সাথে পরিমানমত সবুজ শাক- সব্জির অবশিষ্টাংশ এবং পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে।

এতে করে উম অবস্থায় মুরগি সুস্থ থাকবে এবং ওজন হারাবে না। ডিম গুলো বসানোর ৫-৭ দিনের মধ্যে ডিম উর্বর কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। রাতের আধারে টর্চের আলো দিয়ে ডিমের উর্বরতা পরীক্ষা করা যায়। টর্চের আলোর উপর একটা করে ডিম ধরলে, ডিমের মধ্যে যদি রক্তের চটার মত বা মাকড়সার জালের মত লাল দেখা যায় তবে বুঝতে হবে ডিমগুলো উর্বর অথবা ডিমে বীজ আছে। আর সাদা দেখা গেলে ডিম গুলো সরিয়ে বিক্রি অথবা খেয়ে ফেলুন। ডিম ফুটানোর ২১ দিনের মধ্যে বাচ্চা বের হয়ে আসবে।

ডিমগুলো অবশ্যই বিকাল বা সন্ধ্যার সময় উমে বসালে ভাল হয়। কারন বিকাল বেলায় ডিম উমে বসালে বাচ্চাগুলো ঠিক ২১ দিন পর বিকাল বেলায় ফুটে বের হবে। ফলে সারা রাত বাচ্চাগুলো মা মুরগি থেকে তাপ পেয়ে ঝরেঝরে হবে (ফোটার ১০-১২ ঘন্টা পর বাচ্চাগুলোকে উম থেকে সকালে নামালে ভাল হয়)।

বাচ্চা ফোটার পরপরই বাচ্চা থেকে মাকে পৃথক করা (গরমকালে ৫-৬ দিন এবং শীতকালে ১০-১২ দিন) এবং মাকে বাচ্চার চোখের আড়ালে রাখা মা ও বাচ্চা উভয়কেই সুষম খাদ্য অথবা পরিমানমত ধান, চাউল, কুঁড়া, ভূষি, কলাই, খৈল/সয়াবিন খেতে দেওয়া উচিৎ।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কি লাভ?

- একবার বাচ্চা ফোটানোর পর মা - মুরগি ১৫-২৫ দিনের মধ্যে আবার ডিম পাড়া আরম্ভ করবে।
- মুরগির বাৎসরিক ডিম পাড়ার চক্র ৩ থেকে ৫-৬ বার উন্নীত হয় (অর্থাৎ একটি মুরগি বৎসরে ৩ বার ডিম পাড়ার পরিবর্তে ৫-৬ বার পযন্ত ডিম পাড়বে)।
- ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ৫০ থেকে ১০০ তে উন্নীত হবে। যাহা সনাতন পদ্ধতির দ্বিগুন।

গরীব কৃষকদের আয়মূলক কাজের মধ্যে দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন সবচেয়ে লাভজনক। কারণ কৃষক কম টাকা ব্যবহার করে তাড়াতাড়ি বেশি আয় পেতে পারে এবং বর্তমানে স্থানীয় বাজারে দেশি মুরগির চাহিদা খুবই বেশি এবং ভাল মূল্য পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রাম এলাকায় কৃষকদের মুরগির বাচ্চা পালনে প্রধান সমস্যা অধিক মৃত্যু হার। মৃত্যুর হার কমানো গেলে বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে পারিবারিক আয় বেড়ে যাবে সাথে সাথে পুষ্টির অভাব পূরণ হবে। তাই মুরগির বাচ্চার যত্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে আমরা কিভাবে বাচ্চা পালন করি?

- মা ও বাচ্চাকে এক সাথে ছেড়ে পালন করি।
- কোন ধরনের সুষম খাদ্য ও পানি দেওয়া হয় না।
- রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

ফলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো হয় ঃ

- অধিকাংশ বাচ্চা মারা যায়।
- বন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়।
- ওজন বাড়ে না ।

তাহলে আমরা কিভাবে পালন করবো?

- বাচ্চাকে সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- সময়মত ডটকা দিতে হবে।
- কৃষক যখন কাজে ব্যস্ত থাকে তখন বাচ্চাগুলোকে আটকে রেখে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা এবং যখন অবসর থাকে তখন নজরের মধ্যে চড়তে দেওয়া।
- অবশ্যই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন খাদ্য ও পানির পাত্র ব্যবহার করা।

বাচ্চাকে নিম্নলিখিত উপায়ে যত্ন নিতে হবে ঃ

- বাচ্চা ফোটার পর ৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত মাকে বাচ্চাগুলোকে ওম দিতে দিন এর ফলে বাচ্চাগুলো বেশ ঝরঝরে হবে।
- বাচ্চাগুলোকে ডিম ফোটানোর টুকরি থেকে নামানোর পর শক্তি সরবরাহের জন্য একটি পানির পাত্রে দুই গ্লাস পানিতে (আধা লিটার) এক মুঠ আখের গুড়/চিনি এবং ৮-১০ ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে শরবত তৈরি করে খাওয়াতে হবে। অথবা বাজার থেকে বিভিন্ন কোম্পানীর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পাওডার যেমন- ট্যাংক, সিভিট, টেস্টি স্যালাইন কিনে পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

-

  বাচ্চাগুলোকে দিনের বেলায় বিশেষ যত্ন বা খেয়াল রাখতে হবে। দিনের বেলায় মাটিতে খড় বিছিয়ে এর ওপর শুকনো পাটের চট/বস্তা বিছিয়ে মা-সহ বাচ্চাগুলোকে বাঁশের তৈরি ঝাঁপিন বা পলো দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যাতে চিল, কাক, গুঁইসাপ থেকে রক্ষা করা যায় এবং মা মুরগি বাচ্চাকে ভালভাবে তাপ দিতে পারে। ঝাপিনের মধ্যে খাদ্য ও পানির পাত্র রাখতে হবে যাতে সহজে খাদ্য ও পানি দেওয়া যায়। সরাসরি বাচ্চাকে মাটিতে রাখা যাবে না। মাটিতে রাখলে ঠান্ডা লেগে শ্বাসকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাতের বেলায় মা-সহ বাচ্চাকে বাঁশের তৈরি খাঁচা/ডোলের মধ্যে খড় বিছিয়ে তার ওপর রাখতে হবে। প্রতিদিন সকালে খাঁচাটি রোদে শুকাতে দিতে হবে এবং ৩-৪ দিন পর পর পুরাতন খড় ফেলে দিয়ে নতুন খড় দিতে হবে। এভাবে বাচ্চাকে গরমকালে ৫-৬ দিন এবং শীতকালে ১০-১৫ দিন মায়ের সাথে রাখতে হবে। এরপর মাকে বাচ্চার দৃষ্টির আড়ালে আলাদাভাবে রাখতে হবে ফলে মা ও বাচ্চা ডাকাডাকি করবে না। মা মুরগি তাড়াতাড়ি ডিম পাড়তে শুরু করবে এবং বাচ্চা আলাদাভাবে খেতে অভ্যস্ত হবে।

-

  এক মাস বয়স পর্যন্ত মুরগির বাচ্চাকে উক্ত ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে হয়। এ সময় অবশ্যই বাচ্চাকে সুষম খাদ্য দিতে হবে। এক মাস বয়সের পর বাচ্চা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। তাই এক মাস পর থেকে বাচ্চাকে ছেড়ে পালন করতে হবে। এতে মুরগি পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। এভাবে বাচ্চা পালনের পর ৯-১২ সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করা লাভজনক। কারণ এরপর থেকে খাদ্য অনুপাতে দৈহিক বৃদ্ধি কম হয়।

অধিবেশন-৩ ঃ স্থানীয়ভাবে আমিষ জাতীয় ও খনিজ জাতীয় খাদ্য কি কি এবং উপকারীতা বর্ননা।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপাদান দিয়ে মুরগির বাচ্চার ও মুরগির খাদ্য তৈরি এবং এর ব্যবহার

মুরগি পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া এবং মূল্যবান আমিষ খাদ্যের উপাদান বৃদ্ধি করা। অতএব মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র উপাদান হচ্ছে খাদ্য।

খাদ্য কি?

যেসব উপাদান খেয়ে মুরগি জীবন ধারণ, বৃদ্ধি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাকে খাদ্য বলে।

কেন খাদ্য প্রয়োজন?

- খাদ্যের অভাবে মুরগি বাঁচতে পারে না
- খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সাহায্যে প্রাণী দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়
- খাদ্য মুরগির পালক গঠন ও তৈরি করে
- খাদ্য মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে
- খাদ্যের পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ থেকে মুরগিকে রক্ষা করে

সুষম খাদ্য ঃ

যে খাদ্যে ওজন বৃদ্ধি ও সুস্থ সবল রাখার জন্য সমস্ত উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

বিভিন্ন জাতের খাদ্য ঃ

খাদ্যকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

শর্করা জাতীয় খাদ্য ঃ

যে সমস্ত খাদ্য দেহের শক্তি উৎপাদন করে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। দেহের সমস্ত কার্যক্রমকে সম্পন্ন করার জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য শক্তি এবং তাপ সরবরাহ করে থাকে।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলো হলো ঃ

চাল ভাঙ্গা/খুদ, চাউলের কুড়া, গমের ভূষি/গম ভাঙ্গা, ভাত।

আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ

যে সমস্ত খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন ও দেহের বৃদ্ধি ঘটায় তাকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বলে।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ

শুঁটকি মাছ, সয়াবিন, তিলের খৈল, ডাল ভাঙ্গা, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, উঁই ও ঘুণ পোকা ইত্যাদি।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবে যা হয় ঃ

- শারীরিক বৃদ্ধি কাঙ্খিত পরিমানে হয় না।
- মুরগি দুর্বল ও অসুস্থ হয়।
- বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- কাঙ্খিত পরিমানে ডিম উৎপাদন হয় না।
- কাঙ্খিত ওজন বৃদ্ধি পায় না।

চর্বি বা তৈল জাতীয় খাদ্য ঃ

তৈল জাতীয় খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের মত দেহে শক্তি উৎপাদন করে। তবে তৈল জাতীয় খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি শক্তি দিয়ে থাকে।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত চর্বি বা তৈল জাতীয় খাদ্য ঃ

সয়াবিন তৈল, মাছের অবশিষ্ট তৈলাক্ত অংশ ও খনিজ।

জাতীয় খাদ্য ঃ

মুরগির জন্য খনিজ পদার্থের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খনিজ জাতীয় খাদ্য ঃ

ঝিনুকের গুঁড়া, শামুকের গুঁড়া, খাদ্য-লবণ এবং ডিমের খোসা

খনিজ পদার্থের কাজ ঃ

- মুরগির দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে
- ডিমের বাইরের শক্ত আবরণ তৈরি করে
- বিভিন্ন রোগ নিবারণে খনিজ পদার্থ ভূমিকা রাখে

ভিটামিন ঃ

যে-সমস্ত খাদ্য খুব অল্প পরিমাণে কিন্তু শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে খুবই গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাকে ভিটামিন বলে।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ভিটামিন জাতীয় খাদ্য ঃ

বিভিন্ন সবুজ ঘাস, শাক-সব্জির ফেলে দেয়া অংশ, বিভিন্ন রঙ্গিন ফলমূল ইত্যাদি

ভিটামিনের কাজ ঃ

- দেহের সকল কাজে অংশগ্রহণ করা
- রোগপ্রতিরোধে ক্ষমতা তৈরি করা
- শারীরিক বৃদ্ধি, মাংস উৎপাদন ও ডিম উৎপাদনে অংশগ্রহণ

পানি ঃ

দেহ গঠনে পানির ভূমিকা অপরিসীম। প্রাণী দেহে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি থাকে। পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। তাই পানির অপর নাম জীবন।

মুরগির দেহে পানির কাজ ঃ

- খাদ্যবস্তু নরম ও হজমে সাহায্য করে
- খাদ্যে পুষ্টি উপাদান দেহের সমস্ত অঞ্চলে পরিবহন করে
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে
- দেহ সতেজ করে
- দেহের ভিতর দূষিত পদার্থ অপসারণ করে

সুষম খাদ্য ঃ

যে সমস্ত খাদ্যে মুরগির প্রয়োজন মতো ৬ টি খাদ্য উপাদান আনুপাতিক হারে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির সুষম খাদ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও আমরা বাড়িতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্য উপাদান দিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করতে পারি।

এক কেজি সুষম খাদ্য তৈরি করতে যা লাগে ঃ

চাউলের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩ পোয়া
সয়াবিন / মাসকলাই	৩ মুঠ
শুঁটকি মাছের গুঁড়া-	১ মুঠ
ডিমের খোসা/ঝিনুক চূর্ণ	১ মুঠ
লবণ	১ চিমটি
সবুজ শাক/রঙিন ফলমূল	পরিমাণ মত।

কি পরিমাণ খাওয়াতে হবে ঃ

যেহেতু মুরগি আধা ছাড়া/ছাড়া অবস্থায় পালন করা হয় সেহেতু সে পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। তাই মুরগিকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। প্রতিদিন ৫টি মুরগিকে ১ পোয়া বা ২৫০ গ্রাম পরিমাণ সুষম খাবার খাওয়াতে হবে। কিছু পরিমাণ খাদ্য সকালে দিতে হবে কারণ এ সময় মুরগি খুবই ক্ষুধার্ত থাকে। আবার কিছু খাদ্য সন্ধ্যার সময় দিতে হবে যাতে খাদ্যের লোভে ঘরে ঢুকে। এই খাদ্য যদি মুরগিকে নিয়মিত খাওয়ানো যায় তবে মুরগির ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও মুরগিকে পর্যাপ্ত পরিমান বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে।

দেশি মুরগির বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রে বাসস্থান, টীকা ও খাদ্য সরবরাহ সঠিকভাবে মেনে চললে বাচ্চার মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে যাবে এবং কৃষক কম খরচে অধিক আয় করতে সক্ষম হবে এবং পুষ্টির অভাব পূরণ হবে।

অধিবেশন-৪ ঃ মুরগির রোগ বালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা, ভেসজ পদ্ধতিতে মুরগির রোগ প্রতিরোধ

রোগ কি?

রোগ হলো হাঁস মুরগির শরীরে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা যা হাঁস মুরগির স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে বাধার সৃষ্টি করে। হাঁসমুরগির উৎপাদনে যে কয়েকটি বাধা আছে তার মধ্যে রোগ হলো একটি। রোগের কারনেই অধিকাংশ হাঁসমুরগি মারা যায়।

রোগ কেন হয়?

- হাঁস মুরগিকে সময়মত টিকা না দিলে।
- সুষম খাদ্য না খাওয়ালে।
- ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করলে।
- পরিস্কার বিশুদ্ধ পানি না খাওয়ালে।
- খাদ্য এবং পানির পাত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে।
- ঘরের আশে পাশে পরিস্কর পরিচ্ছন্ন না রাখলে।
- ক্রিমির ঔষধ না খাওয়ালে।

মুরগির নিম্নলিখিত রোগগুলো হয়ে থাকে ঃ

- রানী ক্ষেত বা চুনা পায়খানা
- গুটি বসন্ত
- মুরগির কলেরা
- রক্ত আমাশা
- ক্রিমি
- শ্বাসকষ্ট
- মুরগির গায়ে পোকা বা গুনগুনি

রানীক্ষেত বা চুনা পায়খানা বা চুনা হাগা ঃ

মুরগির রোগের মধ্যে চুনা পায়খানা রোগে সবচেয়ে বেশী মুরগি মারা যায়। এই রোগ সাধারনতঃ সারা বছরই দেখা যায়। এলাকা ভেদে এই রোগকে চুনা হাগা, পীড়া, ঝিমানী রোগ নামে পরিচিত।

রোগ চেনার উপায় ঃ

- মুরগির হাঁচি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- খাওয়া দাওয়া কম করে।
- ঝিমায়, বসে থাকে।
- চুনোর মত সাদা সাদা পায়খানা করে।
- ডিম পাড়া মুরগি ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়।
- অসুস্থ মুরগির ঘাড় বাকা হয়ে যায় এবং খাদ্য খেতে পারে না।
- ডিম পাড়া মুরগি হঠাৎ মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ

এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

মুরগির বাচ্চা এবং মুরগিকে সময়মত টিকা দিতে হবে।

মুরগির বসন্ত ঃ

সারা বছর এই রোগ দেখা যেতে পারে তবে শীতের শেষে, গরমের শুরুতে এই রোগ বেশী দেখা দেয়। এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ১০০ ভাগ বাচ্চা মুরগি বেশী মারা যায়।

রোগ চিনার উপায় ঃ

- ঝুটি, চক্ষু, মাথায় কখনো কখনো পায়ে গুটি দেখা যায়।
- গুটি কালচে হয় এবং ফেটে পুঁচ পড়ে।
- শ্বাস-নিঃশ্বাসে অসুবিধা দেখা দেয়।
- ডিম পাড়া মুরগি ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়।
- বাচ্চার মৃত্যুর হার খুব বেশী।

চিকিৎসা ঃ

কার্যকরী কোন চিকিৎসা নেই।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

রোগ যাতে না হয় সে জন্য নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

রক্ত আমাশয় ঃ

রক্ত আমাশয় মুরগির একটি মারাত্বক পরজীবি ঘটিত রোগ। ১৪ থেকে ২১ দিন বয়সের বাচ্চা মুরগি সবচেয়ে বেশী এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক বাচ্চা মারা যায়। এ রোগের লক্ষনগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ডানা ঝুলে পড়ে।
- কালচে রংয়ের অথবা রক্তযুক্ত মল ত্যাগ করে।
- পালক এলোমেলো হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ

সালফা ক্লোজিন সোডিয়াম (কক্সিকিউর বা এসবি ৩) এবং এমপ্রোলিয়াম (এমপ্রোল) দ্বারা চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়। পর পর ৩-৫ দিন ঔষধ খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে প্রাণী চিকিৎসকের সাথে অথবা সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে ঔষধ খাওয়াতে পারেন।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

এই রোগ যাহাতে না হয় বাচ্চার ১৪-১৬ দিন বয়স থেকে ১ম মাত্রায় এবং ২৮-৩০ দিন বয়সে ২য় মাত্রায় ঔষধ খাওয়ালে রক্ত আমাশয় রোগ থেকে মুরগির বাচ্চাকে রক্ষা করা যায়। বিশেষ ভাবে মুরগির বাসস্থান এবং বিছানা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং মুরগির সংখ্যা ঘর অনুপাতে যাহাতে বেশী না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ক্রিমি ঃ

বিভিন্ন প্রকারের ক্রিমি দ্বারা মোরগ-মুরগি আক্রান্ত হয়। এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত লক্ষনগুলো দেখা যায় ঃ

- মুরগির ওজন কমে যায়।
- পালক উসকো খুসকো (এলোমেলো) হয়।
- বুকের হাড় বের হয়ে যায়।
- ডিম পাড়া কমে যায়/বন্ধ হয়ে যায়।
- অনেক সময় মলের সঙ্গে ক্রিমি বের হতে দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্রিমি ঔষধ পাওয়া যায়। আইপারাজিন সাইট্রেট বা লিভামিজল হাইড্রো ক্লোরাইড জাতীয় ঔষধ প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর খাওয়ালে ক্রিমির আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রোগের টিকা সবসময় হাসপাতালে পাওয়া যায়। ঘর, খাদ্য ও পানির পাত্র সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে। ইঁদুর, আড়শোলা ইত্যাদির উপদ্রব বন্ধ করতে হবে। ঘর সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বাচ্চার বয়স দেড় থেকে দুই মাস হলে ঔষধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

মুরগির কলেরা ঃ

সাধারনতঃ ৩ মাসের অধিক বয়সের মুরগি এবং ডিম পাড়া মুরগিরই এই রোগ বেশী দেখা যায়।

রোগ চেনার উপায় ঃ

- হঠাৎ করে মারা যায়।
- হালকা সবুজ/হলুদ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।
- ঝুটি কালো এবং মাথা ফুলে যায়।
- পায়ের গিরা ফুলে যায়।
- শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়।

চিকিৎসা এবং স্থানীয় ভাবে ভেষজ পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

কলেরা রোগের ক্ষেত্রে সালফার জাতীয় ঔষধ যেমন এম্ভিবেট, কসুমিক্স প্লাস ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায়। এই রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রাণী চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নেয়া ভাল।

প্রতিদিন কিছু পরিমান আদা এবং রশুন সেই সাথে পানির পটে এক টেবিল চামচ কালোজিরার তৈল মিশিয়ে মুরগিকে খাওয়ালে ঠান্ডা জনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আতা পাতা, হলুদ ব্যাক্টেরিয়া নাশক হিসাবে কাজ করে, সজনে পাতা ভিটামিন সি, ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের উৎস। এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবেও কাজ করে।

মুরগির গায়ে আঠালী, উকুন ঃ

মাঝে মাঝে মুরগির গায়ে পোকা এবং উকুন দেখা দেয়। বিশেষ করে বাচ্চা মুরগির বুকের মাংসে লাল রংঙ্গের পোকা হয় এবং ডিম পাড়া ওমের মুরগির ক্ষেত্রে ওমে এক ধরনের ছোট ছোট পোকা হয়। পোকা শরীরের রক্ত খেয়ে ফেলে ফলে মুরগির বাচ্চা বড় হয় না এবং আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে মারা যায়। উমের মুরগির পোকা মুরগির রক্ত খেয়ে ফেলে এবং ডিম ফুটানোতে বাধা দেয়।

রোগ চেনার উপায় ঃ

- বাচ্চা বা বড় মুরগির বুকের মাংসের মধ্যে লাল পোকা দেখা যায়।
- উমের মুরগির গায়ে হাত দিলে হাতের মধ্যে ছোট ছোট পোকা হাটে যা খালী চোখে দেখা যায় না।
- বাচ্চা বা মুরগি দূর্বল হয়ে যায়।
- বসে বসে ঝিমায়।
- খাওয়া দাওয়া কম করে।

চিকিৎসা ঃ

আধা কেজি ছাই, ১ চা চামচ কেরোসিন তৈল এবং একটি কর্পুর (ন্যাপথালিন) গোটা ভেঙ্গে সবগুলো এক সাথে মিশিয়ে মাংসের মধ্যে লাগিয়ে দিলে লাল পোকা, উকুন মরে যায়। উমের মুরগির পোকা দমনের জন্য উমের খরকুটো পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং পুনরায় নতুন একটি নতুন পাত্রে ডিম এবং মুরগি বসিয়ে দিতে হবে। তাহলে উকুন ও আঠালীর আক্রমন থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। যদি এতেও কোন ফল না হয় তাহলে প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- ঘর, খাঁচা সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- মাসে একবার শুকনা চুন ঘরে এবং খাঁচায় পরিমান মত ছিটিয়ে দিতে হবে।
- মোরগ মুরগির জন্য বালির গর্তে গোসলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শ্বাস কষ্ট রোগ ঃ

বাড়ন্ত মুরগি থেকে শুরু করে ডিম পাড়া মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হয়। মুরগির ঘরের পরিবেশ যদি অপিরচ্ছন্ন থাকে এবং ঘরে বিষাক্ত গ্যাস জমা হলে বা ঘরের আলো বাতাস অপর্যাপ্ত থাকলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

লক্ষণ ঃ

- মুরগির কাশি হয়, শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। বিশেষ ভাবে রাত্রে মুরগির ঘরের কাছে গেলে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।
- ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।

চিকিৎসা ঃ

টাইলোসিন টারট্রেট বা টায়ামুলিন হাইড্রোজেন কিউমারেট জাতীয় ঔষধের সাথে ক্লোর টেট্রাসাইক্লিন বা ডক্সিসাইক্লিন জাতীয় ঔষধ এক সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ ঃ

- ঘর এবং মুরগির বিছানা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ কিভাবে ছড়ায় ঃ

- অসুস্থ মুরগির সংস্পর্শে।
- খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্রের মাধ্যমে।
- বাতাসের মাধ্যমে।
- মৃত হাঁসমুরগি খোলা ফেলে রাখলে।
- অপরিস্কার খাঁচা/ঝাপুনির এর মাধ্যমে।

টিকা কিঃ

টিকা হলো কোন জীবানু ঘটিত রোগের সুনির্দিষ্ট জীবানু যা ঐ নিদিষ্ট জীবানু কর্তৃক সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

টিকা কেন দেয়া হয় ঃ

টিকা একটি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। হাঁস মুরগির কতগুলো ক্ষতিকর রোগ আছে যাহা চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না। এই জন্য রোগ হওয়ার আগেই হাঁস মুরগির দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরীর জন্য টিকা প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ টিকা দিলে রোগ হয় না। কথায় বলে সময়মত টিকা দিলে রোগ বালাই যাবে চলে।

টিকা দেয়ার নিয়মাবলী ঃ

- টিকা সব সময় সুস্থ্য সবল হাঁস মুরগিকে প্রয়োগ করতে হয়।
- বাড়ীর আশে পাশে বা বাড়ীর অন্য কোন ঘরে রোগ দেখা গেলে টিকা প্রদান করা যাবে না।
- টিকা গুলানোর ১-১.৫০ ঘন্টার মধ্যে টিকা প্রয়োগ শেষ করতে হবে।
- গরমে টিকা দেয়া যাবে না।
- খুব সকালে (৫-৮) টা এবং বিকাল ৫ টার পর টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- সাধারনত একই বাড়ীর এবং আশে পাশের বাড়ীর সকল মোরগ মুরগিকে এক সাথে টিকা প্রয়োগ করতে হবে। তবেই টিকার সর্বোত্তম ফল পাওয়া যেতে পারে।
- টিকা দেয়ার পূর্বে এবং পরে লেবুর সরবত, চিনির সরবত খাওয়ালে হাঁস মুরগি আরাম অনুভব করে।

টিকা দিলেও রোগ হয়/মুরগি মারা যায় ঃ

টিকা দিলে রোগ হয় কথাটি সঠিক নয়। তবে যে রোগের টিকা দেয়া হয় সেই রোগ ছাড়া হাঁস মুরগি অন্য রোগে মারা যেতে পারে। টিকা দেয়ার সকল নিয়ম কানুন পালন করা হলে মুরগি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতারাং টিকা দিলে রোগ হয় বা মুরগি মারা যায় কথাটি সঠিক নয়।

মুরগির টিকা দান কর্মসূচী ঃ

মুরগিকে সুষ্থ্য ও সবল রাখতে হলে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন প্রকার টিকা দিতে হবে। গ্রামীন মুরগি পালনের ক্ষেত্রে একটি টিকা দান তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা দেয়ার বয়স	মিশ্রন পদ্ধতি	টিকা দেয়ার স্থান	প্রয়োগ পদ্ধতি
বাচ্চা মুরগির রানীক্ষেত বা চুনা পায়খানা রোগ	বাচ্চা মুরগির রানীক্ষেত্রে (বি.সি.আর.ডি.ভি)	৪-৭ দিন	৬ সিসি	চোখে	১ চোখে ১ ফোটা
	পুনরায় বাচ্চা মুরগির রানীক্ষেত্রে (বি.সি.আর.ডি.ভি)	২৪ দিন	৬ সিসি	চোখে	১ চোখে ১ ফোটা
গুটি বসন্ত	পিজিয়ন পক্স	৩-৭ দিন	৩ সিসি	ডানার নীচে	সুই দিয়ে খুচিয়ে দিতে হবে
গুটি বসন্ত	ফাউল পক্স	৩০-৪৫ দিন	৩ সিসি	ডানার নীচে	সুই দিয়ে খুচিয়ে দিতে হবে
বড় মুরগির রানীক্ষেত বা চুনা পায়খানা রোগ	বড় মুরগির রানীক্ষেত্রে (আর.ডি.ভি)	৫৫-৬০ দিন	১০০	রানের মাংসে	১ সি.সি করে ইনজেকশন ৪ মাস পর পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।
ফাউল কলেরা বা ডাইরিয়া	ফাউল কলেরা	৭৫-৯০ দিন		রানের মাংসে	১ সি.সি করে ইনজেকশন ৪ মাস পর পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধি যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের হাঁস/মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

- সময়মত টিকা দিতে হবে।
- ঘর খাঁচা সব সময় পরিস্কার পরিচন্ন রাখতে হবে।
- হাঁস-মুরগি অসুস্থ হলে আলাদা করে রাখতে হবে।
- ঘরের ভিতর মাঝে মাঝে শুকনো চুন ছিটিয়ে দিতে হবে।
- সুষম খাদ্য ও পরিস্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।
- বাজার থেকে হাঁস মুরগি ক্রয় করলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আলাদা ঘরে রেখে এদের কোন রোগ আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ৩ মাস পর পর ক্রিমি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- হাঁস-মুরগি মারা গেলে যত্রতত্র ফেলানো যাবে না।
- অসুস্থ মুরগি জবাই করলে নাড়ী ভূড়ি, পালক মাটিতে ফুতে ফেলতে হবে।

অধিবেশন-৫ ঃ ৪টি মুরগি পালনের ১ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব।

একজন মহিলা প্রথমে ৪টি মুরগি দিয়ে শুরু করতে পারেন। ২ তলা বিশিষ্ট ৪ খোপের একটি ঘর, কাঠ বা যে কোন সস্তা উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘরটি তৈরি করতে ২০০০ টাকা খরচ হতে পারে। চারখোপ বিশিষ্ট ঘরটি নিচের ১ম খোপে মুরগি রাত যাপন এবং ডিম পাড়ার জন্য, নিচের ২য় খোপটি উমে বসার জন্য, উপরের ১ম খোপটি দেড়মাস বয়স পর্যন্ত এবং ৪র্থ খোপটি বাকি দেড় মাস বা বিক্রি পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। প্রতি ২ মাস পর পর বাচ্চাগুলো বিক্রি করা হবে। এভাবে ডিম উৎপাদন, উমে বসা-বাচ্চা ফুটানো, বাচ্চা লালন পালন ও বিক্রয় পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে।

প্রতি ২ মাস অন্তর অন্তর ২৫-২৬টি বাচ্চা উপাদন হবে (২টি মুরগি উমে বসবে)। মোট বাচ্চার পরিমান হবে ১৫০- ১৬০ টি। নিয়মিত টিকা দেওয়ার পর শতকরা ৩০ ভাগ মৃত্যু ধরে জীবিত বাচ্চার পরিমান ১০০ হতে ১০৫টি।

১০৫ টি বাচ্চা অতিরিক্ত ৩ মাস পালন করার পর স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হবে প্রতিটি ১০০ টাকা দরে। প্রতিটি বাচ্চা মুরগি ১ম দিন হতে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত সর্বমোট ৪ টি টিকা (বিসিআরডিভি ২ বার, আরডিবি ১ বার, গুটি বসন্ত, ফাউল কলেরা), ১ বার কৃমির ঔষধ সেবন করবে যার আনুমানিক খরচ ১৮০০ টাকা। প্রতিটি বাচ্চা মুরগিকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত অতিরিক্ত সুষম দানাদার খাবার (স্থানীয় ভাবে তৈরি) দৈনিক গড়ে ২৫ গ্রাম হারে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ১২০টি বাচ্চা মুরগির খাদ্য খরচ ৩০০০ টাকা।

ব্যয়ের খাতঃ	**টাকা**
বাসস্থান তৈরির খরচঃ	২,০০০/-
৬ মাস বয়সের ৪ টি মুরগির দাম ২০০/- প্রতিটি ।	৮০০/-
টিকা এবং কৃমিনাশক (কমিউনিটি ভিত্তিক টিকা কর্মসূচির টিকা গ্রহন)।	১,৮০০/-
অতিরিক্ত সুষম খাবার	৩,০০০/-
মোট	**৭,৬০০/-**

আয়ের খাতঃ	১০,০০০/
৩ মাস বয়সি ১০৫ টি বাচ্চা বিক্রয় প্রতিটি ১০০ টাকা করে	
ডিম বিক্রয় ১৫০ টি প্রতিটি ৮ টাকা করে	১২০০/-
মোটঃ	**১১২০০/-**

১ম বছরে আয়ঃ ১১,২০০-৭,৬০০ = ৩,৬০০

২য় বছরে আয়ঃ ১১,২০০-৪,৮০০ = ৬,৪০০। যেহেতু ২য় বছর ঘর (২০০ টাকা) এবং মুরগি ক্রয় (৮০০ টাকা) বাবদ কোন টাকা খরচ হবে না, তাই ২য় বছর হতে মাসে গড়ে ৫০০ টাকা করে আয় সম্ভব।

ডাল

অধিবেশন-৬ ঃ পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে হাঁস পালনের গুরুত্ব

পারিবারিক আমিষের উৎস হিসেবে হাঁস-মুরগি এবং ডিমের গুরুত্ব অপরিসীম। চাহিদার তুলনা সরবরাহ কম হওয়ায় এর দামও চড়া। ক্ষুদ্র পরিসরে হাঁস-মুরগি চাষ পারিবারি আয় বৃদ্ধি, মাংস বা আমিষ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সাধারনতঃ হাঁস-মুরগি এর ডিম বিক্রয় হতে অর্জিত অর্থ নারি তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে থাকে। এতে নারীর ক্ষমতায়নে হাঁস-মুরগি চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখে।

এক নজরে হাঁস-মুরগি পালনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১. স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করা ।

২. স্বল্প মূলধনে হাঁস-মুরগির ব্যবসা শুরু করা যায় এবং অর্জিত আয় হতে পরিবারের খরচ নির্বাহ করা সম্ভব ।

৩. আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির খামারের জন্য খুব বেশী জমির প্রয়োজন হয় না বিধায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষে এ ব্যবসা করা সম্ভব ।

৪. হাঁস-মুরগির ব্যবসায় অল্প সময়ে অধিক উপার্জন হয়। দরিদ্রতা নিরসনে এর গুরুত্ব অপরিসীম ।

৫. হাঁস-মুরগি হতে ভাল মানের জৈব সার তৈরি হয়। জৈব সার হিসাবে হাঁস-মুরগির মলমূত্র গুরুতপূর্ণ । এ ছাড়া হাঁস-মুরগির মল মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।

৬. হাঁস-মুরগির খাদ্য, ডটকা, ঔষধ পত্র, ও অন্যান্য উপকরণাদি/সরঞ্জামাদি উৎপাদন ও বাজার জাতকরণের সাথে বহু লোকের কর্মসংস্থান জড়িত ।

অধিবেশন-৭ ঃ হাঁসের জাত পরিচিতি, হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

হাঁসের জাত

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাঁস পালন করে থাকে। হাঁসের বিভিন্ন জাত রয়েছে। বাংলাদেশে যে সমস্ত হাঁসের জাত দেখা যায় বা পালন করে থাকে সংক্ষেপে তার বিবরণঃ

দেশী হাঁস

দেশী হাঁস গুলো বিভিন্ন রং এর হয়, আকারে ছোট, গড় ওজন ১ কেজি হতে ১.৫ কেজি হয়। বছরে ৬০ থেকে ৮০ টি ডিম দেয়।

খাকী ক্যাম্পবেল

ডিম উৎপাদন কারী হাঁস হিসেবে পরিচিত। খাকী ক্যাম্পবেল হাঁস তিন রকম রং এর হয়। যেমনঃ- খাকী, কালো এবং সাদা। কিন্তু পুরুষ হাঁসের গায়ের রং খাকী হয়। খাকী ক্যাম্পবেলের উৎপত্তিস্থল ইংল্যান্ড। এরা বছরে ৩২০ টি ডিম দেয়। খাকী ক্যাম্পবেল ৭ মাস বয়স হতে ডিম দেওয়া শুরু করে। শরীরের ওজন ১.৫ কেজি হতে ২.৫ কেজি।

পিকিং

পিকিং হাঁস মাংস এবং ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর উৎপত্তিস্থল চীন। গায়ের রং সাদা। পিকিং হাঁস গড়ে ১৫০- ১৬০ টি ডিম দেয়। এদের গড় ওজন ৪ - ৪.৫ কেজি হয়।

মাসকোভি

আকারে বড়, মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয়। ওজন ৬ - ৭ কেজি হয়। ডিম উৎপাদন ৮০ -১০০টি ।

হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

হাঁসের মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করণের জন্য বাসস্থান অতীব জরুরি। যে স্থানে হাঁস নিরাপদে আশ্রয় আরামে থাকতে পারে তাকে বাসস্থান বলে।

বাসস্থানের গুরুত্বঃ-

- বন্য প্রানি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।
- রোগ বালাই হতে রক্ষার জন্য।
- শারিরিক সুস্থতা ও দৈহিক বৃদ্ধি জন্য।
- নিয়মিত ডিম পাড়ার জন্য।

হাঁসের বাসস্থান তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :-

- পর্যাপ্ত পরিমান আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- হাঁস-মুরগি এক সাথে রাখা যাবে না। অতিরিক্ত হাঁসও একসাথে রাখা যাবে না।
- নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্রের আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- হাঁসের মলে জলীয় বেশি হওয়ার দরুণ, ঘর যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাঁসের ঘর তৈরীর উপকরন সমুহঃ

সুতার জাল, বাঁশ, সুপারি গাছ, গাছের ডাল, শুকনো খড়, নেট , ছন, পলিথিন ইত্যাদি।

বয়সের উপর নির্ভর করে হাঁসের বাসস্থান বিভিন্ন রকম হতে পারে ঃ

বাচ্চা পালন করার জন্য - বয়স্ক হাঁস রাখার জন্য

হাঁসের বাচ্চা পালন করার জন্য বাসস্থান ঃ

গ্রাম পর্যায়ে অধিকাংশ কৃষকের একটি পলো বা ঝাপিনে কতটি বাচ্চা রাখতে হয় তার সঠিক ধারণা নাই। সাধারনতঃ হাঁসের বাচ্চাকে দিনে ঝাপিন/পলোর মধ্যে রেখে পালন করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাচ্চা ফুটানোর উপযুক্ত সময় ফাল্গুন চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)। ফুটানোর পর হাঁসের বাচ্চাকে উঁচু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে। পলোর মধ্যে কিছু পরিমান শুকনো খড় তার উপর একটি চটের ব্যাগ বিছিয়ে তার উপর হাঁসের বাচ্চা রাখতে হবে। পলোর মধ্যে একটি খাদ্য পাত্র এবং একটি পানির পাত্র এমনভাবে রাখতে হবে যাহাতে খাদ্য অপচয় কম হয় এবং পানির পাত্রের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা পানির পাত্রে উঠতে না পারে। কারণ ছোট বাচ্চা পানিতে ভিজলে ঠান্ডা লেগে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। রাতে হাঁসের বাচ্চাকে খাবার ও পানি দেয়ার প্রয়োজন নেই।

রাতে হাঁসের বাচ্চাকে একটি খাঁচায় খড় ও চট বিছিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। যাহাতে ঠান্ডা না লাগে এবং ইঁদুর, চিকা হাঁসের বাচ্চাকে নষ্ট না করতে পারে। হাঁসের বাচ্চাকে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে ভাল করে খাবার ও পানি দিতে হবে যাতে রাতে খাঁচায় খাবার ও পানি দিতে না হয়। কারণ রাতে পানি ও খাবার দিলে খাদ্য অপচয় বেশী হয় এবং পানি ফেলে থাকার জায়গা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় এবং ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে। এই ভাবে হাঁসের বাচ্চাকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত পালন করলে মৃত্যুহার কম হয় এবং বৃদ্ধি ভাল হয়।

বড় হাঁস থাকার জায়গা ঃ

গ্রামীন পর্যায়ে সাধারনতঃ হাঁস দুইভাবে রাখে ঃ

খাঁচায় এবং খোয়াড় বা হাঁসের ঘর

খাঁচায় বা খোয়াড় যেখানেই হাঁস রাখুক সমস্যা হলো- খাঁচা প্রতিদিন পরিস্কার করে না এবং পরিমানের চেয়ে বেশী হাঁস রাখে, ফলে হাঁস রোগ ব্যাধিতে বেশী আক্রান্ত হয়। অনেক সময় হাঁস খাঁচায় মরে থাকে। আর খোয়াড়ে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকে না। পরিমানের চেয়ে বেশী রাখে বা একসাথে হাঁস মুরগি রাখার ফলে ডিম কম পাড়ে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। উপরোক্ত সমস্যাগুলো থেকে রক্ষা পেতে হলে নিম্নে বর্ণিত পরিমাপ অনুযায়ী খাঁচা এবং ঘর করা যেতে পারে।

৪ টি ডিমপাড়া হাঁসের জন্য একটি আদর্শ খাঁচা ঃ

খাচার তলা : ১. ৫ হাত বাই ১.৫ হাত , উচ্চতা : ১ থেকে ১.৫ হাত , মুখ : অর্ধ হাত

৬-৮ টি হাঁস থাকার জন্য একটি আর্দশ ঘরের মাপ নিম্নরূপ ঃ

দৈর্ঘ্য -৩.৫ হাত, প্রস্থ- ২ হাত ও উচ্চতা-২ হাত

ঘরের ব্যবস্থাপনা ঃ

১। হাঁস অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা কোনটাই সহ্য করতে পারে না। এজন্য হাসের ঘরটি ছায়াযুক্ত স্থানে নির্মাণ করা উচিত। ঘরের ভেতরে তাপমাত্রা বেশি না হয় সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

২। আর্দ্রতা বা বাতাসের জলী অংশের পরিমান বেশি হলে হাঁসের ডিম উৎপাদন কমে যায়, ঘরের পরিবেশ স্যাঁতস্যাঁতে হয়, ফলে পরজীবি আক্রমন বেড়ে যায়। হাঁসের রক্ত আমাশয় দেখা দেয় এবং হাঁসের অস্থিরতা বেড়ে যায়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

৩। আলো (কৃত্রিম) ঃ কৃত্রিম আলো সাধারণত : হাঁস-মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে। ৪ বা ৫ টি হাঁসের জন্য সাধারনতঃ কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু বানিজ্যিক ভাবে হাঁস পালনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে হাঁসের বাচ্চার অন্তত ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম দেয়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো সরবরাহ উত্তম। এই অতিরিক্ত সময় কৃত্রিম আলো সকাল অথবা বিকালে যোগ করে অথবা উভয় সময় ভাগ করে দিলেই চলবে। ৩০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ১টি ৬০ ওয়াট বাল্ব যথেষ্ট ।

৪। মেঝে ঃ মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় এবং ইঁদুর প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেনটিলেশন) ঃ দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে ঘরের লম্বালম্বি বেড়ার তারের জালের ব্যবস্থা বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্র ওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬। লিটার (বিছানা) আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে এমন বস্তু লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে । ধানের খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যায় । লিটার সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে উঁচু লিটার (৩”- ৪”) ব্যবহার না করে পাতলা লিটার (১”-২”) ব্যবহার করতে হবে।

৭। খাবার ও পানির পাত্র ঃ খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। টিউব অয়েলের পানি নিরাপদ এবং তা প্রদান করা উচিত।

হাঁসের বাচ্চার তাপ প্রদান ঃ

মুরগি ও হাসেঁর বাচ্চার পালক না উঠা পর্যন্ত সাধারণতঃ তাপ ধারণ ক্ষমতা থাকে না। জন্মের ১ম ২৫-৩০ দিন বয়স পর্যন্ত তাপ প্রদান করতে হয় । মুরগির বাচ্চাকে মুরগি নিজে পাখার নীচ রেখে তাপ দেয়। কিন্তু হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে এই সুযোগ থাকে না। তাই হাঁসের বাচ্চা ফুটানোর উপযুক্ত সময় ফাল্গুন চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)। এই সময় হাঁসের বাচ্চা কম মরে। যদি কেউ শীত অথবা শীতের শেষের দিকে ফুটাতে চায় তাহলে অবশ্যই তাপ প্রদান করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সকাল বিকাল ঝাপিন রৌদ্রে রেখে দিতে হবে (সকাল ৯.০০ থেকে ১০.০০ এবং বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.০০) বাকী সময় ছায়ায় রেখে পালন করতে হবে। রাতে খাঁচায় খড় এবং চট বিছিয়ে খাঁচার মুখ ঢেকে রেখে দিতে হবে এবং খাঁচার চারদিকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এই ভাবে ২৫-৩০দিন প্রতিপালন করতে হবে।

অধিবেশন-৮ ঃ খাদ্য , খাদ্যের উপাদানসমুহ ও এর কাজ

হাঁস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎপাদান বৃদ্ধি করা। অতএব হাঁস উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র উপাদান হচ্ছে খাদ্য।

খাদ্য কি?

যেসব উপাদান খেয়ে হাঁসের জীবন ধারণ, বৃদ্ধি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাকে খাদ্য বলে।

কেন খাদ্য প্রয়োজন?

- খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সাহায্যে প্রাণী দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়।
- খাদ্য হাঁসের পালক গঠন ও তৈরি করে।
- খাদ্য মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- খাদ্যের পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমন থেকে হাঁসকে রক্ষা করে।

সুষম খাদ্য ঃ

যে খাদ্যে ওজন বৃদ্ধি ও সুস্থ্ সবল রাখার জন্য সমস্ত উপাদান উপযুক্ত পরিমানে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

বিভিন্ন জাতের খাদ্য

খাদ্যকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়

শর্করা জাতীয় খাদ্য ঃ

যে সমস্ত খাদ্য দেহের শক্তি উৎপাদন করে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। দেহের সমস্ত কার্যক্রমকে সম্পন্ন করার জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য শক্তি এবং তাপ সরবরাহ করে থাকে।

আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ

যে সমস্ত খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন ও দেহের বৃদ্ধি ঘটায় তাকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বলে।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবে যা হয় ঃ

- শারীরিক বৃদ্ধি ও ওজন কাঙ্ক্ষিত পরিমানে হয় না।
- হাঁস দুর্বল ও অসুস্থ্ হয়।
- বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- কাঙ্খিত পরিমানে ডিম উৎপাদন হয় না।

চর্বি বা তৈল জাতীয় খাদ্য ঃ

তৈল জাতীয় খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের মত দেহে শক্তি উৎপাদন করে। তবে তৈল জাতীয় খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি শক্তি দিয়ে থাকে।

খনিজ জাতীয় খাদ্য ঃ

হাঁসের জন্য খনিজ পদার্থের ভূমিকা অপিরিসীম। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ পদার্থের কাজ ঃ

- হাঁসের দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।
- ডিমের বাইরের শক্ত আবরণ তৈরি করে।
- বিভিন্ন রোগ নিবারণে খনিজ পদার্থ ভূমিকা রাখে।

ভিটামিন ঃ

যে-সমস্ত খাদ্য খুব অল্প পরিমানে কিন্তু শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাকে ভিটামিন বলে।

ভিটামিনের কাজ ঃ

- দেহের সকল কাজে অংশগ্রহণ করা।
- রোগপ্রতিরোধে ক্ষমতা তৈরি করা।
- শারীরিক বৃদ্ধি, মাংস উৎপাদন ও ডিম উৎপাদনে অংশগ্রহণ।

পানি ঃ

দেহ গঠনে পানির ভূমিকা অপরিসীম। প্রাণী দেহে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি থাকে। পানি ছাড়া জীবন কল্পণা করা যায় না। তাই পানির অপর নাম জীবন।

হাঁসের দেহে পানির কাজ ঃ

- খাদ্যবস্তু নরম ও হজমে সাহায্য করে।
- খাদ্যে পুষ্টি উপাদান দেহের সমস্ত অঞ্চলে পরিবহন করে।
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহ সতেজ করে।
- দেহের ভিতর দূষিত পদার্থ অপসারণ করে।

সুষম খাদ্য ঃ

যে-সমস্ত খাদ্যে মুরগির প্রয়োজন মতো ছয়টি খাদ্য উপাদান আনুপাতিক হারে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির সুষম খাদ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও আমরা বাড়িতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্য উপাদান দিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করতে পারি।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা

খাদ্য উপাদান	**স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য তালিকা**
শর্করা জাতিয় খাদ্য	চাল ভাঙ্গা/খুদ, চাউলের কুড়া, গমের ভূষি/গম ভাঙ্গা, ভাত
আমিষ জাতিয় খাদ্য	কেচোঁ, শামুক,শুঁটকি মাছ, সয়াবিন, তিলের খৈল, ডাল ভাঙ্গা, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, উঁই ও ঘুণ পোকা ইত্যাদি
চর্বি জাতিয় খাদ্য	সয়াবিন তৈল, মাছের অবশিষ্ট তৈলাক্ত অংশ
খনিজ জাতিয় খাদ্য	ঝিনুকের গুঁড়া, শামুকের গুঁড়া, খাদ্য-লবণ এবং ডিমের খোসা
ভিটামিন জাতীয় খাদ্য	বিভিন্ন সবুজ ঘাস, শাক-সব্জির ফেলে দেয়া অংশ, বিভিন্ন রঙ্গিন ফলমূল ইত্যাদি

এক কেজি সুষম খাদ্য তৈরি করতে যা লাগে ঃ

চাউলের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩ পোয়া
সয়াবিন / মাসকলাই	৩ মুঠ
শুঁটকি মাছের গুঁড়া-	১ মুঠ
ডিমের খোসা/ঝিনুক চূর্ণ	১ মুঠ
লবণ	১ চিমটি
সবুজ শাক/রঙিন ফলমূল	পরিমান মত।

কি পরিমাণ খাওয়াতে হবে ঃ

যেহেতু হাঁস আধা ছাড়া/ছাড়া অবস্থায় পালন করা হয় সেহেতু সে পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। হাঁস ডিম পাড়া সময় অতিরিক্ত খাদ্যের দরকার হয়। তাই হাঁসকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। প্রতিদিন ৫টি বড় হাঁসকে ১ পোয়া বা ২৫০ গ্রাম পরিমান সুষম খাবার খাওয়াতে হবে। এই খাদ্য যদি হাঁসকে নিয়মিত খাওয়ানো যায় তবে হাঁসের ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। হাঁসকে আধা ছাড়া অবস্থায় পালন করলে খাদ্যর পরিমান বাড়িয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ নিবিড়ি পদ্ধতিতে হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমান বয়স অনুসারে ভিন্ন হয়। হাঁসের বয়স ২০ সপ্তাহ বা ৪ মাস পর্যন্ত খাদ্য দৈনন্দিন ২০-২৫ গ্রাম করে প্রদান করতে হবে। একটি পূর্ণ বয়স্ক হাঁসকে দৈনিক ১২০ গ্রাম করে দিতে হবে।

অধিবেশন-৯ ঃ হাঁসের রোগ বালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

রোগ কি?

রোগ হলো হাঁস মুরগির শরীরে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা যা হাঁস মুরগির স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে বাধার সৃষ্টি করে। হাঁসমুরগির উৎপাদনে যে কয়েকটি বাধা আছে তার মধ্যে রোগ হলো একটি। রোগের কারনেই অধিকাংশ হাঁসমুরগি মারা যায়।

রোগ কেন হয়?

- হাঁস মুরগিকে সময়মত টিকা না দিলে।
- সুষম খাদ্য না খাওয়ালে।
- ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করলে।
- পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি না খাওয়ালে।
- খাদ্য এবং পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে।
- ঘরের আশে পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে।
- ক্রিমির ঔষধ না খাওয়ালে।

রোগ কিভাবে ছড়ায় ঃ

- অসুস্থ মুরগির সংস্পর্শে।
- খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্রের মাধ্যমে।
- বাতাসের মাধ্যমে।
- মৃত হাঁসমুরগি খোলা ফেলে রাখলে।
- খাঁচা/ঝাপুন এর মাধ্যমে।

হাঁসের রোগ ঃ

মুরগির চেয়ে হাঁসের সাধারনত রোগ কম হয়। যদি পরিষ্কার ঘর, পর্যাপ্ত পানি ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা যায় তবে রোগ বালাই খুবই কম দেখা যায়। হাঁসের সাধারনত নিম্নলিখিত রোগগুলো দেখা দেয় ঃ

এক নজরে হাঁসের রোগের তালিকাঃ

- ডাক প্লেগ বা হাঁসের প্লেগ
- ডাক কলেরা বা হাঁসের কলেরা
- কৃমি এবং হাঁসের পায়ে ঘা, গোটা

হাঁসের প্লেগ ঃ

হাঁসের রোগের মধ্যে এই রোগেই সবচেয়ে বেশী হাঁস মারা যায়। যেকোন বয়সের হাঁসই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগ চেনার উপায় ঃ

- পা অবশ হয়ে যায় ফলে নাড়া চাড়া করতে পারে না। বুকে ভর দিয়ে এক জায়গায় বসে থাকে।
- চোখ দিয়ে পানি ঝরে, সবুজ, হলুদ রংঙ্গের পাতলা পায়খানা করে।
- খাওয়া দাওয়া বন্ধ ও ডিম পাড়া হাঁস ডিম দেয়া বন্ধ করে দেয়।
- হঠাৎ করে মারা যায়।
- চোখে অনেক সময় সাদা পাতলা পর্দা পড়ে যায়।
- পুরুষ হাঁসের পুষাঙ্গ পায়ু পথে বেরিয়ে যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

এই রোগ যাহাতে না হয় সেই জন্য ৪-৬ মাস পর পর টিকা দিতে হয়। হাঁসের বাচ্চা ৩০-৩৫ দিন বয়সে প্রথম বার এবং ১৫ দিন পর ২য় বার টিকা দিতে হবে।

পায়ের পাতায় ঘা, গোটা ঃ

হাঁসকে যদি শুকনো জায়গায় বা শক্ত ও শুকনা ইটের টুকরাপূর্ন ঘরে রাখা হয় তাহলে ঘর্ষনে পায়ের পাতায় কোন অংশ ফুলে শক্ত হয়ে যায়। অনেক সময় আক্রান্ত জায়গা থেকে হলুদ পুজ বের হয়। এই রোগ হলে সাথে সাথে প্রাণী চিকৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

এই রোগ যাতে না হয় সে জন্য ঘরের মধ্যে কাঠের গুড়া বা তুষ বিছিয়ে দিতে হবে।

ক্রিমি ঃ

বিভিন্ন প্রকারের ক্রিমি দ্বারা হাঁস আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত লক্ষনগুলো দেখা যায় ঃ

- হাঁসের ওজন কমে এবং বুকের হাড় বের হয়ে যায়।
- পালক উসকো খুসকো (এলোমেলো) হয়। অনেক সময় মলের সঙ্গে ক্রিমি বের হতে দেখা যায়।
- ডিম পাড়া কমে যায়/বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্রিমি ঔষধ পাওয়া যায়। আইপারাজিন সাইট্রেট বা লিভামিজল হাইড্রো ক্লোরাইড জাতীয় ঔষধ প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর খাওয়ালে ক্রিমির আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

ঘর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বাচ্চার বয়স দেড় থেকে দুই মাস হলে ঔষধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

হাঁসের কলেরা ঃ

এই রোগে সাধারনত ৩ মাস বয়সের অধিক বয়সের হাঁস অথবা ডিমপাড়া হাঁস বেশী আক্রান্ত হয়।

রোগ চেনার উপায় ঃ

- বার বার সবুজ বা হলুদ বর্ণের পাতলা পায়খানা হয়।
- নাক, মুখ দিয়ে পানি পড়ে।
- মাথা এবং হাটু ফুলে যায় ফলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটে।
- পাখা মাটির সাথে ঝাপটিয়ে বুকে ভর করে চলা ফেরা করে।

অধিবেশন-১০ ঃ টিকা কি ও কেন? টিকা দেওয়ার নিয়মাবলী

টিকা কি?

টিকা হলো কোন জীবানু ঘটিত রোগের সুনির্দিষ্ট জীবানু যা ঐ নিদিষ্ট জীবানু কর্তৃক সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

টিকা কেন দেয়া হয় ঃ

টিকা একটি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। হাঁস মুরগির কতগুলো ক্ষতিকর রোগ আছে যাহা চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না। এই জন্য রোগ হওয়ার আগেই হাঁস মুরগির দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরীর জন্য টিকা প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ টিকা দিলে রোগ হয় না। কথায় বলে সময়মত টিকা দিলে রোগ বালাই যাবে চলে।

টিকা দেয়ার নিয়মাবলী ঃ

- টিকা সব সময় সুস্থ্য সবল হাঁস মুরগিকে প্রয়োগ করতে হয়।
- বাড়ীর আশে পাশে বা বাড়ীর অন্য কোন ঘরে রোগ দেখা গেলে টিকা প্রদান করা যাবে না।
- টিকা গুলানোর ১-১.৫০ ঘন্টার মধ্যে টিকা প্রয়োগ শেষ করতে হবে।
- গরমে টিকা দেয়া যাবে না।
- খুব সকালে (৫-৮) টা এবং বিকাল ৫ টার পর টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

- সাধারনত একই বাড়ীর এবং আশে পাশের বাড়ীর সকল মোরগ মুরগিকে এক সাথে টিকা প্রয়োগ করতে হবে। তবেই টিকার সর্বোত্তম ফল পাওয়া যেতে পারে।
- টিকার বীজ পরিবহন এবং সংরক্ষনের সঠিক তাপমাত্রা মেনে চলতে হবে।
- টিকা দেয়ার পূর্বে এবং পরে লেবুর সরবত, চিনির সরবত খাওয়ালে হাঁস মুরগি আরাম অনুভব করে।

অধিবেশন-১১ ঃ হাঁসের টিকা প্রদান তালিকা

হাঁসের টিকা প্রদান তালিকা

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা দেয়ার বয়স	টিকা দেয়ার স্থান	পরিমান
হাঁসের প্লেগ রোগ	ডাক প্লেগ টিকা	১ মাস	বুকের মাংসে	১ সি.সি করে
	ডাক প্লেগ টিকা	৪৫ দিন (বুষ্টার)	বুকের মাংসে	১ সি.সি করে ইনজেকশন ৪ মাস পর পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।
হাঁসের কলেরা রোগ	হাঁসের কলেরা টিকা	৬০ দিন	রানের মাংসে	১ সি.সি করে ইনজেকশন ৪ মাস পর পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধি যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

- সময়মত টিকা দিতে হবে।
- ঘর খাঁচা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- হাঁস মুরগি অসুস্থ হলে আলাদা করে রাখতে হবে।
- মৃত হাঁস মুরগি মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- ঘরের আশপাশ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে।
- ঘরের ভিতর মাঝে মাঝে শুকনো চুন ছিটিয়ে দিতে হবে।
- সুষম খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।
- বাজার থেকে হাঁস মুরগি ক্রয় করলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আলাদা ঘরে রেখে এদের কোন রোগ আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে।
- ৩-৪ মাস পর পর ক্রিমি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- অসুস্থ হাঁস মুরগি জবাই করলে নাড়ী ভূড়ি, পালক মাটিতে ফুতে ফেলতে হবে।

অধিবেশন-১২ ঃ পারিবারিক পর্যায়ে ২০ টি হাঁস পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

প্রাকৃতিক খাদ্যর উপস্থিতি বা সরবরাহের উপর ভিত্তি করে হাঁস পালন অত্যন্ত লাভজনক। হাওরে পানি সরবরাহের উপর ভিত্তি করে কৃষক সাধারণতঃ হাঁস ক্রয় করে এবং শীতের শেষে যখন পানি শুকিয়ে যায়, তখন বিক্রি করে দেয়। যেহেতু হাওরের বিপুল জলাশয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক খাবার থাকে, হাঁস এসব খাবার খেয়ে ডিম দেয়, যার দরুণ কৃষককে অতিরিক্ত কোন খাবার বাজার হতে কিনে খাওয়ানোর দরকার হয় না। ফলে খরচ কম হয় এবং লাভজনক।

এক নজরে ২০ টি হাঁস পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব (৬ মাস)

ব্যয়		
বিষয়	**একক মূল্য (টাকা)**	**মোট খরচ**
২০টি হাঁসের ক্রয় মূল্য	২০০	৪০০০
টিকা, কৃমিনাশক ঔষধের খরচ	১০	২০০
খাদ্যের উৎসঃ পারিবারিক ও প্রাকৃতিক		
মোট		৪২০০
আয়		
বিষয়	**একক মূল্য (টাকা)**	**মোট খরচ**
ডিম বিক্রয় ১২০০ টি	৮	৯৬০০
হাঁস বিক্রয় ১৫টি	৩০০	৪৫০০
মোট		১৪১০০

মোট লাভঃ (১৪১০০-৪২০০) = ৯৯০০

বিশেষ দ্রস্টব্যঃ

১টি হাঁস বছরে গড়ে ৬০ টি ডিম দেয়। মোট ডিম উৎপাদন ২০ * ৬০ = ১২০০ টি। পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর হাঁস বিক্রয় করে দেওয়া হবে। প্রতিটি হাঁসের বিক্রয় মূল্য ৩০০ টাকা।